রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিশ্বভারতী প্রয়াস

উমা দাশগুপ্ত

বিশ্বভারতী বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানটিকে বুঝি তা শুরু হয়েছিল ১৯০১-এ একটি ছোট বিদ্যালয় রূপে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ, তার নাম দেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বিদ্যালয়ের স্থান হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর দেবেন্দ্রনাথ ভুবনডাঙ্গা গ্রামে কুড়ি বিঘা জমির মৌরসি পাট্টা গ্রহণ করেন রায়পুরের প্রখ্যাত জমিদার ভুবনমোহন সিংহের থেকে। সেই বছরে একটি অতিথিশালার ভিত্তি স্থাপিত হয় যার নাম রাখেন 'শান্তিনিকেতন'। মহর্ষির দেওয়া অতিথি গৃহের এই নাম থেকে জায়গার নামও 'শান্তিনিকেতন' হয়ে ওঠে।

গৃহীদের কথা ভেবেই এই আশ্রম করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সেই গৃহে অতিথিরা যাতে বিশেষ নিয়ম পালন করে দুই-তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করে যেতে পারেন তার জন্য উপাসনা মন্দির, লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শান্তিনিকেতন স্মৃতি' থেকে জানতে পারি সেই কালে শান্তিনিকেতনের জমি কেমন অনুর্বর ছিল। তাই সেখানকার প্রান্তরের কাঁকর মেশানো জমি তুলে ফেলে, ভাল মাটি এনে, তবেই তাঁরা চারিদিকে উদ্যান তৈরি করেন নানা ফল ও ফুল গাছ দিয়ে।

এই আয়োজনটুকুকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আশ্রমে এসে বিদ্যালয় গড়েছিলেন। তাঁর লেখায় পাই,

> 'শিলাইদহে পদ্মা তীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম — একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।...'

আমাদের মনে এবারে প্রশ্ন জাগে, কী ছিল রবীন্দ্রনাথের এই 'সৃষ্টির সংকল্প' যার জন্য তিনি তাঁর নিরালা সাহিত্য চর্চা ছেড়ে এলেন? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর নিয়ে আমরা ক্রমশ আলোচনা করতে পারি।

প্রশ্নের সহজ একটি উত্তর হল যে রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শ বিদ্যালয়ের কল্পনা গড়ে উঠেছিল। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানি অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ তখনকার ইস্কুলের রীতি প্রকৃতি, শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ, অপছন্দ করেন। আমরা যথার্থই মনে করতে পারি শৈশবের সেই অভিজ্ঞতার বেদনায়

যেন গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। শৈশবকালের শহরবাস এবং গৃহবন্দি জীবন তার কাছে অসহনীয় বোধ হয়েছিল। তাঁর সন্তানদের জন্য তাই খুঁজেছিলেন এমন একটা জায়গা যেখানে ছেলেদের দেহে মনে পড়বে প্রকৃতির স্পর্শ, শহর-জীবনের নানা বদ্ধতার বাইরে। তিনি লেখেন,

> 'প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপটি কি তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গে ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে। কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। ব্যবহৃত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে।
>
> কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোন একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ রচনা প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণায় ছিল কেবলমাত্র বাণী রূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব শিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্য আশ্রমের দরকার যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।"

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষা এবং প্রতিদিনের জীবনকে এক করতে। ঔপনিবেশিক যুগের পশ্চিমী শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল মাত্র একটি কারণে যে সেই শিক্ষা ভারতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই শিক্ষা ভারতীয় সমাজের স্থান, কাল, পাত্রের ভেদাভেদ আরও তীব্র করে তুলেছিল। সেই বিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন সমগ্র জীবনের শিক্ষার উদ্যোগ। ক্রমে ক্রমে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাঁর নিত্যকার পাঠ্য ছিল সংস্কৃত এবং ইংরাজি। তিনি বলতেন, ইংরাজি ভাষার ভেতর দিয়ে নানা বক্তব্য বিষয়ে আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপত্তি ছিল অন্যত্র। ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয় মনে একটা নিঃস্বতা এনে দিয়েছিল। সেই শিক্ষার সমস্ত উপাদানই প্রায় ভারতকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি —

> ''সকল দেশের শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি-ওকালতি-ডাক্তারি-ডেপুটিগিরি-দারোগাগিরি-মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্র সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমোরের চাকা ঘুরিতেছে, সেখানে এই শিক্ষার কোন স্পর্শ পৌঁছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাঁর কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।"

অধিকাংশ ভারতীয় গ্রামবাসী। শিক্ষার উদ্যোগে তাই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ অতি আবশ্যক মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষা, নতুন বিদ্যালয় গড়ে তোলা তাঁর সংকল্পের নিবিড়তম সূত্র বলা

যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

> ''ভারতবর্ষে যদি সত্যি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সেই বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রায় কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শ চাষ করিবে। গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছি।''

১৯১৮ থেকে বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৮ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। ওই বছর থেকে বিশ্বভারতী বিধিবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়। এই যুগে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এরূপ পূর্ণতা পেল। তারপর, বিশ্বভারতীর একটি মূল অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতন থেকে দুই মাইল দূরে, সুরুল গ্রামে, 'কৃষি ও পল্লী সংগঠন কেন্দ্র'। তারই নাম দেওয়া হল শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের সংকল্পের আলোচনায় আগেই উল্লেখ করেছি, পল্লী চর্চা এবং পল্লী সংগঠন ব্যতিরেকে ভারতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক গ্রাম জীবন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন চর্চায় আবশ্যক ছিল। শ্রীনিকেতন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এই লক্ষ্যটি আরও সমৃদ্ধ হয়।

গ্রাম ও শহরকে যুক্ত করবার পরিকল্পনায় শ্রীনিকেতনই সেই যুগের প্রথম পদক্ষেপ। যখন থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে তাঁদের পৈতৃক জমিদারিতে বাস করতেন তখন থেকেই এই ভাবনা তাঁর মনে আসে যে অবহেলিত গ্রামাঞ্চলকে পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি জানতেন যে বিশাল প্রয়োজনের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্থান নিতান্ত সামান্য। জানতেন বেশি কিছু করতে সক্ষম হবেন না। তাও তিনি এই কাজের আদর্শ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর দুটি লক্ষ্য ছিল — গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেওয়া, এবং গ্রামবাসীদের জীবনে পূর্ণতা ফিরিয়ে আনা। পুরনো দিনে গান, নাটক ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠের প্রচলন ছিল গ্রামে, সেই সব ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলেন। তিনি লেখেন,

> ''যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদহ থেকে পতিসর, নদী-নালা-বিলের মধ্য দিয়ে তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে। মনের আনন্দে, কৌতুহল মিটিয়ে, দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্য কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারী-ব্যবসা করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক-বৃত্ত করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল।''

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উপযুক্ত শিক্ষা পেলে গ্রামবাসীরা নিজেদের ইস্কুল, শস্যের গোলা, ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভাণ্ডার গড়তে ও চালাতে সমর্থ হবে। স্বনির্ভরতাই শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠনের প্রধান কার্যকারণ ছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষির উন্নতি করার লক্ষ্য। ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন

কৃষিবিজ্ঞান ও গোপালন বিদ্যা শিখে আসতে। ১৯০৯ সালে স্নাতক হয়ে তাঁরা দেশে ফিরে আসেন এবং শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন।

বিশ্বভারতীর বিকাশে রবীন্দ্রনাথের সংকল্পের আরেকটি মূল ভিত্তি ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের যে বিশাল এবং ভিন্ন প্রকারের সংস্কার ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার ছিল তার থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র এক ধরনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই শিক্ষার মূলে ছিল একদিকে একটা আদর্শ ভারতীয় রূপ, আর অন্যদিকে পৃথিবীর প্রতি বিশেষ এক উদার উন্মুক্ত মনোভাব। প্রথম যুগের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছিল সেই বিশেষ ভারতীয় রূপের প্রতীক। সেই রূপ আশ্রমের রূপ, তপোবনের রূপ।

সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীর মধ্যে ফুটেছিল ভারত-আত্মার আরও একদিক যার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের প্রতি ভারতের আতিথ্য, ভারতের চর্চা, বিশ্বের সংস্কৃতিতে ভারতের ঔৎসুক্য, ভারতের নিষ্ঠা এবং মানবপ্রেম। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী যুগের সূচনায়। তারপর, বিশ্বভারতীতে পরিণত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বিশ্বমৈত্রীর সংকল্পে, সমসাময়িক অসহযোগ আন্দোলন সত্ত্বেও। স্বদেশি যুগে প্রয়োজন ছিল ইংরাজি ইস্কুলের পাশাপাশি স্বদেশি প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধংদেহি পৃথিবীতে প্রয়োজন ছিল বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের মূল শিক্ষা-চিন্তার আরও কয়েকটি যুগান্তকারী দিক নিয়ে আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের সকল চিন্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং সমগ্র শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটি। বিশ্বভারতী বলতে আমাদের বুঝতে হবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সমগ্র শিক্ষা প্রণালী। শুধু ক্লাসের শিক্ষা নয় — জীবন ধারণের শিক্ষা, বিশ্বকর্মের শিক্ষা, বিশ্ববোধের শিক্ষা। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তার জীবনে নিষ্ঠা আনে, তার বিদ্যাচর্চায় ঐক্য আনে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, এই রকম উদ্যোগ থেকে দেশের মননশক্তি, আত্মশক্তি, আত্মসম্মান, পূর্ণভাবে ফিরে আসবে। তার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন মনে করতেন। এক, ভারতবর্ষকে জানা আর দুই বিশ্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

> ‘‘আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চেয়েছি। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তি দান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞান জগত থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।’’

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

> ‘‘সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্য সম্মেলন হবে।’’

শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় মনের দাসত্ব দূর করা, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনের মূল লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া, শুধুমাত্র জীবিকার জন্যই শিক্ষা নয়, সেই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাষায় উদ্ধৃত করছি,

> ''জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোন একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, একথা যদি না মানি তাহলে নিতান্ত ছোট হয়ে যাই।
> এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথম বিদ্যালয় পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরের নানা প্রকার চিত্ত-বিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেজন্যই এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।''

সব মিলিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রয়াস ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের পরিকল্পনা, যে সমাজের গুরু, শিষ্য, গৃহী, অতিথি সবাই, বাঙালি ও অবাঙালি সবাই, ভারতীয় অভারতীয় সবাই প্রতিবেশী হবে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতিবেশীদের জানবে, ভালবাসবে, সেবা করবে। চেয়েছিলেন সহায়তা ও সৌহার্দ্য এই দুটির মর্ম শিশুদের মনে প্রবেশ করবে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেও যাতে এই সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এও চেয়েছিলেন ছাত্র যাতে মুক্তির স্বাদ পায়, আত্ম কৃতিত্বের অধিকার পায়। আকাশের নিচে হবে ক্লাস, তাদের একমাত্র আসবাব হবে একটি আসন। এইভাবে, শিক্ষক বিদ্যার্থীরা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হবেন, উভয়ের আদর্শ হবে ব্রহ্মচর্য বা সরল জীবনযাত্রা।

আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে তাঁর বিশ্বভারতী প্রয়াস কতটা কার্যকরী হয়েছিল। সজোরে বলতে পারি ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দুটি দশকে বিশ্বভারতীর অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল রূপ বিকশিত হয়। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ চার রকমের মানুষকে যুক্ত করেছিলেন। প্রথম, যাঁরা আচার্য, তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন পৃথিবীর পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠদের মধ্যে থেকে। শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সর্বনের সিলভ্যাঁ লেভি, প্রাগের মরিট্স্ উইনটারনিট্স্ ও ভিনসেন্ট লেস্ নি, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেন্ কোনো, রোমের কার্লো ফরমিকি ও জুসেপ্পে তুচ্চি। বিশ্বভারতীর গ্রাম পরিকল্পের কাজে এসেছিলেন ইংল্যান্ডের কৃষি বিজ্ঞানী লেনার্ড এল্মহার্স্ট এবং মার্কিন দেশ থেকে ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হ্যারি টিমর্বাস্। দ্বিতীয়, যাঁরা ছাত্র। অনেকে এলেন বিদ্যালয়ের জ্ঞানীগুণী শিক্ষকগোষ্ঠী থেকে, তাঁদের মধ্যে থেকে কিছুজন ছিলেন বাইরের অনুরাগী ও বিদ্বান ছাত্র। এঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সপ্তাহে-সপ্তাহে এসে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতেন। এসব ছাত্ররা অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গবেষণায় রত ছিলেন। তৃতীয় যাঁরা নিযুক্ত অধ্যাপক, যাঁদের উপর বিশ্বভারতীর নিয়মিত পঠন পাঠনের ভার ছিল। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় এঁদের উদ্ভাসিত উল্লেখ পাই :

> ''আমাদের আসনগুলো ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আরেকটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহন বাবু সমাগত, আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে ইংরেজি সাহিত্য পিপাসুরা অ্যাণ্ড্রুজের চারিদিকে সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাদের ছাত্র এসে জুটেছে। তাছাড়া, আমাদের যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পার্সি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহন বাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের চর্চা করবেন।''

বিশ্বভারতীর সঙ্গে চতুর্থ এক ধারাকে যুক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁরা বান্ধব। তাঁরা ছিলেন বিশ্বভারতীর শুভার্থী, ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে। বিশ্বভারতীর মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। মাঝে মাঝে তাদের আহ্বান করা হত লিখতে, বলতে এবং বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। বিশেষ শুভার্থীদের মধ্যে উল্লেখ করতে পারি মহাত্মা গান্ধি, জহরলাল নেহেরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রোমাঁ রোলাঁ, প্যাট্রিক গেডিস্, লেনার্ড ও ডরথী স্ট্রেট, এল্‌মহার্স্ট। সবার উপরে সহায় ছিলেন আজীবন চার্ল্‌স্ অ্যাণ্ড্রুজ।

এইরকম নানা উপায়ে বিশ্বভারতীকে দাঁড় করানো হয় : সক্রিয় মৌলিক বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে, পল্লীসংগঠনের পথিকৃৎ হিসেবে, আন্তর্জাতিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গমস্থল হিসেবে।

সব সত্ত্বেও বোধহয় জিজ্ঞাসা থেকে যায় রবীন্দ্রনাথ কি মনে করেছিলেন তাঁর বিশ্বভারতী আদর্শ সফল হয়েছে স্বদেশবাসীর কাছে? বিশ্বভারতীর প্রভাব ও বিস্তার যে কতটা সীমিত তা অবশ্যই তিনি বুঝেছিলেন তাও নিরাশ না হয়ে তিনি লেখেন,

> ''আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাইহোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড় ছিল তা হচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোন সম্বন্ধ ছিল না, এমনকি বিছানা তৈজসপত্র সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।
>
> কিন্তু আধুনিককালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তাহলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেজন্য এই বিদ্যালয়ের আকৃতি-প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। তাহলেও সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্রে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।''

ভবিষ্যতের আশা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও লেখেন,

> ''হয়ত আমারই চরিত্রে এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপন কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা যে সমস্তই নিষ্ফল হয়নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতিটি শিশু পর্যন্ত তাদের অবকাশ মুখরিত সংগীত-অভিনয়-কলহাস্যের দ্বারাও সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু, প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্য সাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, কোনো এক দিন এর বীজ নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।''

সবশেষে আমরা ভেবে দেখি রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বভারতীর মূল আইডিওলজিটা কী দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ উদার মানুষ, এমন উদারতা পৃথিবীতে বিরল। তাঁর স্বদেশ চিন্তায়, তাঁর সমাজ-চিন্তায়, তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তায় সেই উদারতার স্পর্শ রেখে গেছেন। সকল চিন্তার আধার ছিল তাঁর বিশ্বভারতীর আইডিয়াল। সেই আইডিয়ালের ভিত্তি ছিল মানুষের সত্য। মানুষের সত্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, 'আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে'। এই

সত্য চিরন্তন কিন্তু প্রাক-আধুনিককালে ছোট সীমার মধ্যেই সত্য কাজ করত। আধুনিককালে, অর্থাৎ যে কালে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে ছিলেন, এবং আমরা যেখানে আজও আছি, বিজ্ঞানের প্রগতিতে ভৌগোলিক বেষ্টন এবং জাতির বেড়া ভেঙে যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে জলে-স্থলে, দেশে-দেশে, যে সকল বাধা মানুষকে বাইরে থেকে বিভক্ত করে রেখেছিল, তা ক্রমেই শিথিল হয়ে যায়। দেশগত সীমানার অর্থ ক্রমেই ঘুচে যায়। সেই সত্যটা মনে না মানতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। তার প্রমাণ রয়েছে বিশ্বযুদ্ধে, কাটাকাটি মারামারি সন্দেহে হিংসায়। তাই তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর আইডিয়াল হোক সেই সত্যের সাধনা যার দ্বারা মানব সমাজের অতিথি অভ্যর্থনা সাধন হতে পারে। বিশ্বভারতী যাতে ভারতবর্ষের হয়েও বিশ্বের হয়ে উঠতে পারে।

যাঁরা প্রশ্ন করছেন যে ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হয়ে কী করে এমন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, তাঁদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

> ''দারিদ্র যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এসব কথা কেন'? আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এই সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করার শক্তি রাখে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশ-বিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুক। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার তপস্যা করেছে, সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে। বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের এই পূর্ণগৌরব সাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক্ এই আমাদের সংকল্প।''

উমা দাশগুপ্ত : ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্রগবেষক।